ভোক্তা অধিকার : ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাংলাদেশে আইনগত প্রতিবিধান

নাসরীন লুবনা*

[সারসংক্ষেপ : বিশ্বায়নের যুগে একুশ শতকে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার মানবাধিকারের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারগুলো যে কোনো নাগরিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এর অধিকাংশই বিদ্যমান আইন দ্বারা সংরক্ষিত। তাই ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারের লঙ্ঘন মানবাধিকারের লঙ্ঘন। বিভিন্ন দেশে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা এবং সকল দেশে বসবাসকারী ক্রেতা-ভোক্তাদের মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য ১৯৮৫ সালের ১৬ই এপ্রিল জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ নির্দেশিকা (UNO Guidelines) গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার আইনগত রূপ লাভ করেছে। জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশ হিসাবে উন্নত দেশসমূহ এমনকি এশিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাদের দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য আইনগত বিধান নিশ্চিত করেছেন। ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নতদেশসহ কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও বাংলাদেশে ক্রেতা-ভোক্তাদের দুর্দশার অন্ত নেই। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০৯ সালে আইনটি আলোর মুখ দেখলেও আজও ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার সংরক্ষিত হয়নি। মাধ্যমিক উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বর্তমান নিবন্ধটিতে বাংলাদেশে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারের বর্তমান অবস্থা, ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের ইতিহাস ও সাম্প্রতিক অগ্রসরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]

১. সূচনা

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ব্যাপক প্রচলনের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থায় টিকে থাকার স্বার্থে ব্যবসায়ীগণ সংগত কারণেই ক্রেতার পছন্দ ও ক্রয় অভিপ্রায়কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। ব্যবসায়ের প্রতি ক্রেতার অনুকূল মনোভাব এবং আনুগত্য, প্রতিযোগিতায় নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করার উপায় হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ ক্রেতা সন্তুষ্টির বিষয়ে দৃশ্যত যত্নবান হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে সন্তুষ্ট ক্রেতা অনুগত ক্রেতায় পরিণত হয়। সে লক্ষ্যে ক্রেতা-ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধান বর্তমান বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থার কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিকতর সন্তুষ্টি বিধানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন বর্তমানে ব্যবসায় একটি দর্শন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাজারজাতকরণ দর্শন নামে ১৯৫০-এর দশকে এই দর্শনটির চর্চা শুরু হয় এবং ভোক্তা 'মহারাজা' হিসাবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ব্যবসায়ী কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেও উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে এর ভিন্ন চিত্র

*সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী।

বিদ্যমান। দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনুন্নত দেশগুলোতে বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর, দরিদ্র দেশসমূহে ক্রেতা-ভোক্তা সন্তুষ্টি ব্যবসায় দর্শন হিসেবে এখনও কার্যকর হয়নি। বরং নানারকম হয়রানি, ব্যবসায়িক অসাধুতা ও অন্যায্যতা এদেশগুলোর নৈমিত্তিক ঘটনা – যার অনিবার্য ফল ক্রেতা-ভোক্তাগণ অহরহ অসাধু, মুনাফালোভী, স্বার্থান্বেষী বণিক ও কারবারিদের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে, লঙ্ঘিত হচ্ছে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার।

২. ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি

বর্তমান বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক বাজার-ব্যবস্থায় ক্রেতা-ভোক্তা সবচেয়ে শক্তিশালী পক্ষ হিসেবে স্বীকৃত। যে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও ব্যর্থতা ক্রেতা-ভোক্তার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে। এ কারণে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড ভোক্তার চাহিদা ও সন্তুষ্টির উপর ভিত্তি করে নির্ণিত হয়। বাংলাদেশসহ অসংখ্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে অসাধু ব্যবসায়ীদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ক্রেতা-ভোক্তাদের চরম ভোগান্তি একরকম নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অসাধু ও অযৌক্তিক মুনাফালোভী ব্যবসায়ীচক্রের অন্যায্য ও অনৈতিক ব্যবসায়িক আগ্রাসন থেকে ক্রেতাস্বার্থ রক্ষার তাগিদ থেকেই শুরু হয় ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমেই ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। শিল্পবিপ্লবের পর দ্রুতগতিতে কল-কারখানা গড়ে ওঠায় শ্রমিক অসন্তোষ, ঝুঁকিপূর্ণ কর্মএলাকা, শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ, শিশুশ্রমসহ নানাবিধ ক্রেতা-ভোক্তা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এরই ফলে ১৮৯১ সালে নিউইয়র্কে প্রথম 'কনজ্যুমার লিগ' গঠিত হয় (Aaker & Day, ১৯৮৪)। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমস্ত দোকান মালিক কর্মচারীদের ন্যায্য মজুরি দেয়, যাদের স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা রয়েছে ও শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে যুক্তিসঙ্গত ঘণ্টা কাজ করায়, তাদের তালিকা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এই সংস্থা কাজ শুরু করে।

১৯৩০ সালের মাঝামাঝি আমেরিকায় ঔষধ কেলেঙ্কারি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে দ্বিতীয় দফায় ভোক্তা আন্দোলন শুরু হয়। শিকাগো শহরে সায়ানাইড মিশ্রিত টাইলিনল ক্যাপসুল খেয়ে কিছু মানুষ মারা গেলে টাইলিনল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'জনসন এন্ড জনসন'সহ অন্যান্য ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের মুখে কোনঠাসা হয়ে পড়ে। টাইলিনল কেলেঙ্কারির প্রতিক্রিয়ায় ঔষধসহ সমস্ত খাদ্যসামগ্রীর সেফটি-সিলের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পায় এবং 'ইউ. এস. ফেডারেল ল' পাশের মাধ্যমে ক্রেতা-ভোক্তার নিরাপত্তা বিধান করা হয়। খাদ্য, ঔষধ বা প্রসাধন সামগ্রীতে কোনো কিছু মেশানো হলে অপরাধকারীর সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান ও সামান্য অসত্যের কারণে ২৫০,০০০ ডলার অর্থদণ্ডসহ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধান প্রণীত হয় (Loudon & Bitta, ১৯৯৩)।

বিশশতকের ৬০-এর দশকে তৃতীয় দফায় ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলন শুরু হয়। ৫০-এর দশকে খোদ আমেরিকাতে ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে থাকে। একচেটিয়া ব্যবসা প্রসারের মাধ্যমে অধিক মূল্য আদায় করা তাদের নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়। এছাড়া ওজনে কম দিয়ে ও ভেজাল পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমেও ক্রেতা-ভোক্তাদেরকে প্রতারিত করে। এহেন পরিস্থিতিতে সেখানকার ক্রেতাসাধারণ সংগঠিত ও সোচ্চার হতে থাকে এবং ধীরে

ধীরে দানা বেঁধে ওঠে আন্দোলন। উদ্ভব হয় ক্রেতা-ভোক্তাদের বিপ্লবী চেতনার। নাটকীয়ভাবে এই বিপ্লবের স্বীকৃতি মেলে এক ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে। ১৯৬২ সালের ১৫ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশনে ভোক্তা অধিকার বিল পেশ করেন। অসহায় ভোক্তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি ক্রেতা-ভোক্তাদের চারটি অধিকারের স্বীকৃতি দেন। এই চারটি অধিকার হলো : নিরাপত্তার অধিকার, তথ্য জ্ঞাত হবার অধিকার, ন্যায্য মূল্যে পছন্দসই পণ্য বা সেবা ভোগের অধিকার এবং অভিযোগ করা ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার। ঐতিহাসিক ঘোষণার দুই দশক পর এই দিনটি স্মরণে ১৯৮৩ সাল থেকে 'বিশ্ব ক্রেতা অধিকার দিবস' পালন শুরু হয়, যা প্রতিবছরই নব উদ্যমে নতুন প্রত্যয়ে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে। ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলনকারী রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। আমেরিকায় সমগ্র ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনকে চারটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ এই চারটি যুগের পরিচিতি এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ এবং এর ভবিষ্যৎ বিস্তৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে বিশেষ সহায়ক হবে।

২.১ প্রাথমিক যুগ

বিংশ শতাব্দীতে ক্রেতা-ভোক্তারা ভয়াবহ অশান্তি ও অস্বস্তিতে জীবনযাপন করতে থাকে। ১৯০৫ সালে অপটান সিনক্লেয়ার *দি জংগল* নামে একটি গ্রন্থে শিকাগোতে মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেন (Mower, ১৯৯৩)। এই বইটি এতটাই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা এর প্রতিকারার্থে 'দি মিট ইন্সপেকশান অ্যাক্ট, ১৯০৬' পাশ করতে বাধ্য হয় (Loudon & Bitta, ১৯৯৩)। এই আইনটি পাশের ফলে মাংস প্রক্রিয়া ও প্যাকেটজাত করার সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর প্রায় ১৪ বছর পরে ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা 'ওয়াটার পাওয়ার অ্যাক্ট' পাশ করে (Mower, ১৯৯৩)। ভেজাল পণ্য বিক্রয় বন্ধ ও প্রসিদ্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য ১৯০৬ সালে 'দি ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কমিশন' এবং একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধের লক্ষ্যে ১৯১৪ সালে 'দি ফেডারেল ট্রেড কমিশন' স্থাপন করা হয়। যথেষ্ট পরিমাণ আইন পাশ হলেও ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলন এই যুগে একটি স্থায়ী রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়নি। ক্রেতা বা ভোক্তাদের অবস্থা নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায় : "আমরা সবাই ভোক্তা – অর্থনীতির বৃহত্তম চালিকা শক্তি, সকল প্রকারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ দ্বারা প্রভাবিত বৃহত্তম গোষ্ঠী – অথচ কেউই আমাদের কথা শোনে না, আমাদের অসহায়ত্বে বাড়ায় না সাহায্যের হাত।" (হাসান, ২০০২)

২.২ তথ্য যুগ

ক্রেতা-ভেক্তা আন্দোলনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যুগ– তথ্য যুগ। ১৯২৭-১৯৩৯ সালে স্টুয়ার্ট চেজ এবং এফ. জে. স্কলিঙ্ক-এর বই *ইয়োর মানিস ওর্থ* পুনরায় বাজারে ক্রেতা-ভোক্তাদের দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরে। এই বইটি মূলত পণ্যের প্যাকেজিং এবং বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে রচিত হয়। প্যাকেজিং এবং বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া সঠিক পণ্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা-ভোক্তাকে সহযোগিতা না করে বরং ঐ পণ্যের বিক্রি-বাড়িয়ে দেয়। উক্ত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য *ইয়োর মানিস ওর্থ* পণ্য

পরীক্ষণের জন্য যথার্থ বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আহ্বান জানায়, যে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদকের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ক্রেতা-ভোক্তাদের জন্য সঠিক পণ্য মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রদান করবে।

২.৩ নিরবচ্ছিন্ন ভোক্তা সম্পর্কীয় কর্মকাণ্ডের যুগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধপরবর্তী বছরগুলোতে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতিসমূহ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয় এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকটা দেশ তাদের পুনর্গঠন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। এই সময়ে বেশ কিছু আইন পাশ হলেও মূলত ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার আন্দোলনের চেয়ে জীবন ও জীবিকার পুনর্গঠনেই জনশক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল। 'দি ফার প্রোডাক্ট লেবেলিং অ্যাক্ট', 'দি ফ্লেমিং প্রোডাক্ট অ্যাক্ট' এবং 'দি হ্যাজার্ডাস সাবসটেন্স লেবেলিং অ্যাক্ট' এই সময়ে প্রবর্তিত আইনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দি ফার প্রোডাক্ট কোমল পশুলোম থেকে নির্মিত পোশাকসহ অন্যান্য সামগ্রীর লেবেলিং বাধ্যতামূলক করে এবং লেবেলিং অ্যাক্টে পণ্যের লেবেলিং-এর ক্ষেত্রে কোন কোন তথ্য দিতে হবে সেটাও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। দি ফ্লেমেবল প্রোডাক্ট অ্যাক্ট অগ্নিবৎ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাঁচামাল থেকে গার্মেন্টস সামগ্রী প্রস্তুত নিষিদ্ধ করে। অন্যদিকে দি হ্যাজার্ডাস সাবসটেন্স লেবেলিং অ্যাক্ট দৈনন্দিন ব্যবহার্য যে সমস্ত দ্রবাদি বিষাক্ত, অগ্নিবৎ অথবা উত্তেজক পদার্থ দিয়ে তৈরি, সেই পণ্যের লেবেলিং-এ সতর্কবাণী মুদ্রণ আবশ্যিক করে (Mower, ১৯৯৩)।

২.৪ ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের আধুনিক যুগ

১৯৬২-১৯৮০ সাল পর্যন্ত সময়কে ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের আধুনিক যুগ বলা হয়। কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির চারটি ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারের কথা উত্থাপনের মধ্য দিয়ে ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের আধুনিক যুগের সূচনা হয়। কংগ্রেসে যে চারটি অধিকারের কথা বলা হয়েছিল তা হলো :

- নিরাপত্তার অধিকার : যে পণ্য জনস্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে তা বিপণন করা যাবে না।
- জানার অধিকার : যে কোনো পণ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ক্রেতাকে অবশ্যই তথ্য সরবরাহ করতে হবে। সকল ক্রেতার এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অধিকার রয়েছে।
- অভিযোগকরণের ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার : ক্রেতাস্বার্থ পরিপন্থী যে কোনো বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করার অধিকার রয়েছে প্রতিটি ক্রেতার।
- পছন্দমাফিক পণ্য বাছাই করার অধিকার : ন্যায্যমূল্যে পছন্দসই ও প্রয়োজনানুযায়ী পণ্য কেনার অধিকার আছে যে কোনো ক্রেতার। একচেটিয়া কারবারি অবস্থা কিংবা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ক্রেতাদের অধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। (আহমেদ, ২০০১)

উপরিউক্ত চারটি অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কংগ্রেসে নানাবিধ অ্যাক্ট পাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ 'দি সিগারেট লেবেলিং অ্যান্ড অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাক্ট, ১৯৬৬' অনুযায়ী সিগারেটের

প্যাকেটে "ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" সার্জনের এই সতর্কতাবাণীর সংযুক্তি বাধ্যতামূলক করা হয়। 'শিশু সুরক্ষা আইন, ১৯৬৬' অনুযায়ী ক্ষতিকর খেলনা বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয় এবং 'দি কনজ্যুমার ক্রেডিট প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ১৯৬৮' অনুযায়ী ক্রেডিট গ্রহীতাকে অর্থনৈতিক চার্জ ও ক্রেতা ঋণগ্রহণ অথবা কিস্তিতে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাকে ক্রেডিটের সম্যক শর্তাদি এবং অর্থনৈতিক দাবি সম্পর্কে জানানো বাঞ্ছনীয়।[১]

৩. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার

ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘের নির্দেশনাবলি (UNO Guidelines) পাশ হওয়ায় পর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শ্রেণির ক্রেতা-ভোক্তা সংগঠন এবং নানা প্রকার ক্রেতা-ভোক্তা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পাশাপাশি রাজনৈতিক ও আইনগতভাবেও ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকারের বিষয়টি বিভিন্ন দেশে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার ও নিরাপত্তার বিষয়টি সন্তোষজনক হলেও বাংলাদেশে ক্রেতা-ভোক্তাদের বিষয়টি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

৩.১ ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার : প্রেক্ষিত ভারত

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ নির্দেশিকায় (UNO Guidelines) স্বাক্ষরদানকারী ১৮৫টি দেশের মধ্যে অন্যতম দেশ হিসেবে ভারত এই নির্দেশিকা গ্রহণের পরের বছরেই অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে 'দি কনজ্যুমার প্রোটেকশান অ্যাক্ট, ১৯৮৬' পাশ করে। পরবর্তীকালে এই আইনটিকে অধিক যুগোপযোগী করার জন্য ১৯৯২ সালে ও ১৯৯৯ সালে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালের সংশোধিত আইনানুযায়ী যদি বিক্রেতা পণ্যের ক্ষতিপূরণ ও মেরামতের অঙ্গীকার নাও করে, তথাপি ক্রেতা-ভোক্তা ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী।[২] যে কোনো উন্নয়নমূলক কাজে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বর্তমানে ভারতে অসংখ্য সংগঠন স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করছে। এই সংগঠনের সংখ্যা ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি ৮০টি প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে ২০০১ সালে ১৫০০টি প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয় (Verma, 2002 : ১০৭-১২৩)। ২০০৩ সালে ডিপার্টমেন্ট অফ কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্সের অনুমোদন প্রাপ্ত সংগঠনের সংখ্যা ছিল ২০০০ যারা ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। ক্রেতা-ভোক্তাদের সুরক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই সংগঠনগুলো নানাজাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। ক্রেতা-ভোক্তাদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই সংগঠনগুলো বিভিন্ন প্রকার কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে। কিছু কিছু ক্রেতা-ভোক্তা সংগঠন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেগুলোর গুণগতমান সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে।

অনেক ক্রেতা-ভোক্তা সংগঠনের অবস্থান খুবই দৃঢ় এবং এই সংগঠনগুলো ক্রেতা-ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করে এবং প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে আইনগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। কিছু কিছু সংগঠন ক্রেতা-ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে বিভিন্ন প্রকার প্রকাশনা, পত্রিকা ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করে থাকে। সরকারের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় এই সংগঠনগুলো গড়ে

উঠেছে এবং ক্রমান্বয়ে ও প্রয়োজনের তাগিদে কাজের পরিধি বৃদ্ধি করে চলেছে। ভারতে শিল্পজাত পণ্যের মান নির্ধারণের জন্য ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন (আইএসআই) গঠিত হয়। 'দি ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড (বিআইএস) অ্যাক্ট, ১৯৮৬' দ্বারা ১৯৮৭ সালের ১লা এপ্রিল আইএসআই-এর ডিপার্টমেন্টস অব কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স 'দি ব্যুরো অব ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যারা মিডিয়া অথবা ক্রেতা-ভোক্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে থাকে। ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন আজ অবধি ১৭,৬০০টি ভারতীয় পণ্যের মান নির্ধারণ করেছে যার মধ্যে ২০০০টি পণ্য সাধারণ ক্রেতা-ভোক্তাদের স্বার্থের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।[৩]

১৯৯১ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার 'কনজ্যুমার ওয়েলফেয়ার ফান্ড' গঠন করে। এই ফান্ডের অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় হবে, তা 'দি কনজ্যুমার ওয়েলফেয়ার ফান্ড রুলস, ১৯৯২' দ্বারা নির্ধারিত হয়। ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ এই ফান্ডের অর্থ থেকে স্বেচ্ছাসেবী ক্রেতা-ভোক্তা সংগঠনগুলোকে সহায়তা প্রদান করা হয়। ক্রেতা-ভোক্তা মামলার বিচার শেষে সংক্ষুব্ধ ক্রেতা-ভোক্তা, 'ক্রেতা-ভোক্তা ওয়েলফেয়ার ফান্ড' থেকে ব্যয় মঞ্জুরি পেতে পারে। ১৯৯২ সালে ৫০টি বিখ্যাত ক্রেতা-ভোক্তা সংগঠনের সমন্বয়ে 'কনজ্যুমার কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল' গঠিত হয়। এটি এমন একটি ফোরাম যা ক্রেতা-ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। এই স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সমস্ত ক্রেতা-ভোক্তা সংগঠনের সকল ক্রেতা-ভোক্তা একজায়গায় মিলিত হয়ে ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে, অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে। এর মাধ্যমে ক্রেতা-ভোক্তাদের বিদ্যমান সমস্যার আলোচনা এবং সমস্যা উত্তরণের উদ্যোগগুলোকে একত্রকরণের সুযোগসৃষ্টি হয় – যা সংগঠনের ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে।

উপরে আলোচিত উদ্যোগসমূহ ছাড়াও 'দি রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট' পাশ করে ভারত সরকার ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখে। ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে (The Daily Star 2006) এই আইনটি পাশ হওয়ার ফলে ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই আইনের ফলে জনগণ তাদের ভোগান্তি এবং প্রতারণা, বিশেষ করে সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। এই আইন পাশের ফলে ভোক্তাগণ জাতীয় নিরাপত্তা, সংসদের ডকুমেন্ট এবং আদালতের গোপনীয় তথ্য ছাড়া যে কোনো বিষয়ে তথ্য জানতে চাইতে পারে, যা ক্রেতা-ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

২০১৯ সালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন কেন্দ্রীয় আইন সভায় পাশ হয়। সুরক্ষা আইনে ৬টি অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে : নিরাপত্তার অধিকার, পণ্যের উপাদান, ব্যবহারবিধি, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ইত্যাদি তথ্য জানার অধিকার, পছন্দমাফিক পণ্য বাছাই করার অধিকার, কোনো পণ্য বা সেবা ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার, অভিযোগ করার ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার এবং ক্রেতা-ভোক্তা হিসাবে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষালাভের অধিকার। ২০২০ সালের ২০শে জুলাই এই আইনটি কার্যকর হয়। বাজারজাত ও পণ্য সম্পর্কে

অসন্তোষ দেখা দিলে ক্রেতা-ভোক্তা এই আইনের বিধান অনুযায়ী অভিযোগ জানাতে পারবে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এই আইনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩.২ ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার : প্রেক্ষিত মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ার ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের ইতিহাস অন্যান্য দেশের চেয়ে ভিন্নতর। এদেশে ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের উত্থান তৃণমূল পর্যায় থেকে হয়নি। সমাজের সবচেয়ে উঁচু এবং শিক্ষিত শ্রেণি থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যার কারণে ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলন সেখানে ভিন্নমাত্রা পায়। মালয়েশিয়ার একজন বিখ্যাত নেতা আনোয়ার ফয়জাল (Anwar Faizal) ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলন সংসদে শুরু করেছিলেন। ১৯৬৪ সালে সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ড. লিম চং ইউ (Dr. Lim Chong Eu) ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার রক্ষার্থে ক্রেতা-ভোক্তা সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। কারণ, পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি বা ক্রেতা-ভোক্তাদের মধ্যে নানা কারণে অসন্তোষের মাত্রা বাড়তে থাকলে ক্রেতা-ভোক্তারা একসাথে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন করতে পারবে। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্রেতা-ভোক্তারা একটি সভা আহ্বান করে 'পেনাং কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলে। কিন্তু সে সংগঠন ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারেনি। অন্য আরেকটি দল ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে সেলংগারে মিলিত হয়ে 'সেলংগার কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তোলে। গোহ কিং টং (Goh Kwee Teng) ও রুবি লি'র (Ruby Lee) সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় সৈয়দ আদম আল-জাফরি (Syed Adam Al-Jeffri) ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠায় সেলংগার কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্ব দেন। এই সংস্থাটিই মালয়েশিয়াতে ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখে এবং 'দি ইন্টারন্যশনাল অরগানাইজেশন অফ কনজ্যুমার ইউনিয়ন'-এর সদস্যপদ লাভ করার পর তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে।

৭০-এর দশকের প্রথমদিকে যখন একটি জাতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় তখন ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা ঘটে। ক্রেতা-ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদেশে প্রদেশে ক্রেতা-ভোক্তা সংগঠন গড়ে ওঠা শুরু হলে তাদের কাজের সমন্বয়ের জন্য একটি জাতীয় ফোরামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৭০ সালে সেলংগার এবং পেনাং কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন পেনাংয়ের ক্যামেরন হাইল্যান্ডে মিলিত হয় এবং ১৯৭৪ সালে 'দি ফেডারেশন অব মালয়েশিয়ান কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। যদিও মালয়েশিয়াতে ক্রেতা-ভোক্তার অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান তথাপি জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ নির্দেশিকায় স্বাক্ষরদানের ১৪ বছর পরে ১৯৯৯ সালে মালেশিয়া 'দি কনজ্যুমার প্রোটেকশান অ্যাক্ট' পাশ করে। 'কনজ্যুমার প্রোটেকশান অ্যাক্ট' পাশের পর কনজ্যুমার প্রোটেকশান কাউন্সিলের ন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি বডিকে 'ন্যাশনাল কনজ্যুমার পলিসি' প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করে এবং মালয়েশিয়া সরকার ২০০২ সালে 'ন্যাশনাল কনজ্যুমার পলিসি' প্রণয়ন করে। 'ন্যাশনাল কনজ্যুমার পলিসি' ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার, ক্রেতা-ভোক্তা শিক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদি ভোগের ক্ষেত্রে সরকার, উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা-ভোক্তার করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান

করে। ২০১৯ সালে আইনটিকে আরও যুগোপযোগী করতে প্রয়োজনীয় অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়।

৩.৩ ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার : প্রেক্ষিত শ্রীলংকা

১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ নির্দেশিকা গৃহীত হবার পর পৃথিবীব্যাপী এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ নির্দেশিকায় এমনভাবে দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে যেন উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রধানগণ ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যুগোপযোগী আইনকানুন ও নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতিসংঘ কর্তৃক ক্রেতাস্বার্থ সংরক্ষণ নির্দেশিকা গ্রহণের অনেক পূর্বেই ১৯৭৯ সালে শ্রীলংকার সরকার প্রধান ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার আইন পাশ করেছে এবং সেখানে জাতিসংঘ স্বীকৃত আটটি অধিকারই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমনকি 'ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার আইন, ১৯৭৯' পাশ করার আগেই শ্রীলংকায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (Gunasekera, ২০০২ : ৫-৭)। শ্রীলংকার সরকার পণ্য ও সেবাসমূহের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সেদেশের সরকার ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার আইনের বিধানের সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের অযথা মূল্যবৃদ্ধি, সেবাসমূহের ক্ষেত্রে অধিক চার্জ আদায় করা থেকে ক্রেতা-ভোক্তাদেরকে রক্ষার জন্য এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটায়। শ্রীলংকায় 'ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড' (DIT) ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার আইন বাস্তবায়ন করে। ২০১১ সালে দেশটিতে 'ভোক্তা সুরক্ষা ইউনিট' প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.৪ ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার : প্রেক্ষিত যুক্তরাজ্য

ষাটের দশকের পর থেকে পশ্চিমা বিশ্বে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারের বিষয়টি অনেকদূর এগিয়েছে। ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'দি ফেয়ার ট্রেডিং অ্যাক্ট, ১৯৭৩' এর অধীনে 'ডিপার্টমেন্ট অফ 'ট্রেড এবং 'কনসালটেটিভ কমিটি ফর প্রোটেকশন অব কনজ্যুমার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইনানুযায়ী ফেয়ার ট্রেডিংয়ের জন্য একজন ডিরেক্টর জেনারেল নিয়োগ করা যায়। সংসদ ৩০ বছর আগের প্রায় ২০টি আইনকে একত্রিত করে ডিরেক্টর জেনারেলের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়। ডিরেক্টর জেনারেল পণ্য ও সেবা লেনদেন সংক্রান্ত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়বদ্ধ থাকেন। ফেয়ার ট্রেডিং অফিস বাজার মনিটরিং এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য উপদেশ দান, ক্রেতা-ভোক্তা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা, ক্রেতা-ভোক্তাদের কাছে তথ্য সরবরাহ, ক্রেতা-ভোক্তাদের প্রতি নজর দেয়াসহ ফেয়ার ট্রেডিং, কনজ্যুমার ক্রেডিট ও স্টেট এজেন্ট অ্যাক্টের আওতায় ভোক্তা ঋণনীতি এবং অন্যান্য আইনগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে একটি 'কনজ্যুমার অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন' স্থাপন করে। ১৯৯৮ সালে ফেয়ার ট্রেডিংয়ের ডিরেক্টর ক্রেতা-ভোক্তা শিক্ষা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে 'ন্যাশনাল কনজ্যুমার এডুকেশন পার্টনারশিপ' (NCEP) গঠন করেন। যদিও যুক্তরাজ্যে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার সঠিকভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে তথাপিও ক্রেতা-ভোক্তা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার শিকার হলে অধিকতর সহজ উপায়ে প্রতিকার পেতে পারে তার জন্য 'দি ফেয়ার ট্রেডিং অ্যাক্ট'-এর কিছু অংশ সংশোধন করেছে সে দেশের

সরকার। যুক্তরাজ্য ২০২২ সালের ২০ এপ্রিল ভোক্তা সুরক্ষা আইনের উল্লেখযোগ্য সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছে যার মাধ্যমে জাল রিভিউ বা পর্যালোচনা জমা দেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (CMS Law- Now, ২০২২)

৩.৫ ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার : প্রেক্ষিত সুইডেন

সুইডেন তথ্য যুগ থেকে ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করে আসছে। দেশটি অনেক আগে থেকেই নিরাপদ পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ক্রেতা-ভোক্তাদের নিরাপদ জীবন-যাপনের নিশ্চয়তা প্রদান করে আসছে। সুইডেনের সরকার ১৯৪০ সাল থেকে ক্রেতা-ভোক্তাদের পণ্য ও সেবা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে যাচ্ছে (Rahman, ১৯৯৪)। বিভিন্ন পণ্যের স্বল্পতায় বিকল্প পণ্য সম্পর্কিত তথ্য দেয়ার জন্য 'অ্যাকটিভ হাউজ কিপিং' নামে সরকার একটি তথ্য ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া ক্রেতা-ভোক্তাস্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সুইডেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাদ্যসামগ্রী, নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্য ও পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতিতে উৎপন্ন আলু, পেঁয়াজ, গাজরসহ শাক-সবজি সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। এছাড়া ১৯৫১ সালে সরকারের অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'ভিডিএন ইন্সটিটিউট' স্থাপিত হয় যার দায়িত্ব হলো পণ্যের তথ্য সম্বলিত লেবেলিং নিশ্চিত করা। যেখানে পণ্যের উপকরণ, পণ্যটির ব্যবহার প্রণালি এবং উপকরণের গুণাগুণসহ বিস্তারিত তথ্য থাকতে হয়। ১৯৫৭ সালে নানাজাতীয় পণ্যের উপর গবেষণা ও গবেষণালব্ধ তথ্য প্রকাশের জন্য একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়। পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত কোনো অসন্তোষ থাকলে ক্রেতা-ভোক্তাদের অভিযোগ করার জন্য এই কাউন্সিল একটি অভিযোগ বোর্ডও গঠন করে। ১০০০ সুইডিস শিল্পোদ্যোগী সংস্থা নিয়ে 'সুইডিস মার্কেটিং ফেডারেশন' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত, অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এই ফেডারেশন বাজার অর্থনীতির উন্নয়নের অভিপ্রায়ে বিপণনের ক্ষেত্রে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও নৈতিকতার চর্চাকে উৎসাহিত করে। এই ফেডারেশন ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে (Edling, ১৯৯৮)। সুইডিস সরকার তিনটি কেন্দ্রীয় এজেন্সির সমন্বিত উদ্যোগে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারকে একটি সন্তোষজনক অবস্থানে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

৩.৬ ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার : প্রেক্ষিত অস্ট্রেলিয়া

'দি ট্রেড প্রাকটিস অ্যাক্ট, ১৯৯৩' এবং 'দি অস্ট্রেলিয়ান কম্পিটিশন' এবং কনজ্যুমার কমিশনের বিভিন্ন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে অস্ট্রেলিয়ায় ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্ট্রেলিয়ান সরকার ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার এবং কম্পিটিশন পলিসি মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দিয়েছে (Wijesinghe, 2002 : 8-11)। জাতীয় কম্পিটিশন নীতির চাহিদা বিবেচনা এবং কাউন্সিলকে উপদেশ প্রদানের জন্য ১৯৯১ সালে 'দি কাউন্সিল অব অস্ট্রেলিয়ান গভর্নমেন্ট' (COAG) একটি স্বতন্ত্র অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। 'ন্যাশনাল কম্পিটিশন পলিসি' বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯৭ সালে 'ন্যাশনাল কম্পিটিশন কাউন্সিল' গঠন করা হয়। 'অস্ট্রেলিয়ান কম্পিটিশন অ্যান্ড কনজ্যুমার কমিশন' পণ্যের নিরাপত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। উৎপাদনকারী ও

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিরাপদ পণ্য পাবার অধিকার ক্রেতা-ভোক্তার আছে। উৎপাদনকারীরা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের পণ্যের অভিপ্রেত ও নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা উপস্থাপন করে এবং খুচরা ব্যবসায়ীরা ক্রেতা-ভোক্তার কাছে এ সকল তথ্য উপস্থাপন করে নিরাপদ পণ্য ভোগের অধিকার নিশ্চিত করে।

৩.৭ ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক তো নয়ই বরং একেবারে নিম্নে, বলা যায় প্রাথমিক স্তরে। ভেজাল পণ্য, মূল্যে কারচুপি, ওজনে কারচুপি, অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি, ব্যবসায়ীদের প্রতারণা, বাজার ও পণ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যেই আবর্তিত হচ্ছে বাংলাদেশের সহজ-সরল মানুষ। পৃথিবীব্যাপী ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলন যখন ক্রেতা-ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় অনেকদূর এগিয়ে গেছে তখন বাংলাদেশের ক্রেতা-ভোক্তারা তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক পিছনে পড়ে আছে (ফারুক, শামসুজ্জোহা, ২০০৬) যদিও ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার রক্ষার জন্য বাংলাদেশে অনেক আইন প্রণীত হয়েছে যেগুলো নিম্নে সন্নিবেশিত হলো :

Legislation in British Era, Pakistan Era & Bangladesh Era

Year	Legislation
1860	The Penal Code
1889	The Merchandise Marks Act
1930	Sale of Goods Act
1937	The Agricultural Produce (Grading and Marking) Act
1940	The Trade Mark Act
1950	The Imports and Exports (Control) Act
1957	The Essential Commodities Act
1959	The Pure Food Ordinance (E.P. Ordinance No. LXVIII of 1959)
1967	The Pure Food Rules
1970	The Price and Distribution of Essential Commodities Ordinance
1973	The Essential Commodities (Storage, Keeping Disposal) Order
1974	The Special Power Act
1982	The Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance
1984	The Breast-milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance
1985	The Bangladesh Standards and Testing Institution
1989	The Iodine Deficiency Disorders Prevention Act
1990	The Breast-milk Substitutes (Regulation and Marketing) Act
1990	Madokdrabya Niyantran Ain [Narcotics Control Act], (Ordinance No. XX of 1990)
1997	The Fish and Fish Product (Inspection and Quality Control) Rules
2009	The Consumer Protection Act

উপরে উল্লিখিত আইনগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এর অনেকগুলো পাকিস্তান শাসনামলে এবং কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ আমলে প্রণীত। আইনগুলো আজও বলবৎ রয়েছে আমাদের দেশে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যে আইনগুলো প্রণীত হয়েছে, তাও ক্রেতা-ভোক্তাস্বার্থ রক্ষার্থে ততটা কার্যকর নয়। কারণ, এই আইনগুলোতে এতই নগণ্য অর্থদণ্ড ও শাস্তির বিধান রয়েছে যে, তা দ্বারা একজন ব্যক্তিকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা অসম্ভব। এছাড়াও এই আইনের বিধান অনুযায়ী একজন সংক্ষুব্ধ ক্রেতা-ভোক্তা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সরাসরি মামলা করতে সমর্থ নয়। আইনানুযায়ী সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তার পক্ষে মামলা দায়ের করতে পারে। যেহেতু একজন ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেতা বা ভোক্তা তার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে সরাসরি আদালতে যেতে পারেন না, কাজেই বর্তমানে বলবৎ আইনগুলো অকার্যকর ও সময়ের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বলে দাবি করা যায়। এগুলোকে যুগোপযোগী করতে হলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংশোধন করা প্রয়োজন। যেখানে একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মানুষ ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে নানাজাতীয় সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে, সেখানে সংক্ষুব্ধ ক্রেতা-ভোক্তার হাতে মামলা করার অধিকার ন্যস্ত করাটাই যৌক্তিক হবে।

আমাদের নিকটবর্তী বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোতে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৯ সালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন পাশ করেছে এবং এই আইনের আওতায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর গঠিত হয়েছে। এই আইন পাশের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। যদিও বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতিমালায় যথাসময়ে স্বাক্ষরদান ও সংহতি জানাতে বিন্দুমাত্রও কালক্ষেপণ করেনি। ১৯৮৫ থেকে ২০০৮ এই তেইশ বছরে বিশ্বব্যাপী ভোক্তা আন্দোলন এবং এ সম্পর্কিত নীতিমালা ও আইন ব্যবস্থাতে আমূল পরিবর্তন আসলেও বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে আশাব্যঞ্জক কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। যদিও এ সংক্রান্ত ব্যাপক জনমত ছিল, হয়েছে আন্দোলন এবং সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অজস্রবার তাগাদা দেয়া হয়েছে। বহু বছরের নিরলস পরিশ্রমে কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জোরালো দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে অসংখ্য সভা-সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী এবং সরকার ও বাণিজ্য সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ ১৯৯৫ সালে এই আইনটির একটি খসড়া সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর আইনের খসড়াটি পর্যালোচনা প্রক্রিয়ায় ২১ জুন ১৯৯৮ সালে খসড়া আইনের আবারও একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয় (Ahmed, ২০০১)। ২০০০ সালের ২৯ অক্টোবর আইন কমিশন এই খসড়া আইনটি পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত রূপ দেয়ার লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করে। বিগত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সরকারের আমলে এই আইনটি পাশের জন্য বিবেচিত হলেও আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সচিব কমিটির বৈঠকে পাঠানো হয়। ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের খসড়া একটি সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ২০০৪ সালে সংসদের অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত রূপ পায় কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি।[৪]

বাংলাদেশের ২০০৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ২০০৪ সালের চূড়ান্ত আইনের খসড়ার পরিবর্তন করে, বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি কর্তৃক সংশোধিত 'ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৬' অনুমোদনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেখানেও সাধারণ ক্রেতার সরাসরি আইনগত প্রতিরোধের (মামলা করার) সুযোগ রাখা হয়নি। ২০০৪-এর ক্রেতা-ভোক্তা আইনের সংশোধিত রূপ ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার আইন, ২০০৬ পাশ হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই এই খবর দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বিষয়টিকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে। ক্যাব আইনটি পর্যালোচনা করে দেখে, প্রকৃতপক্ষে কোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই আইন পাশ করা হচ্ছে। কারণ এ-ধরনের আইন প্রণীত হয় ক্রেতা-ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায়, আর বাংলাদেশে যে আইনটি প্রণীত হতে যাচ্ছে তা অনেকটা ক্রেতা-ভোক্তাদের স্বার্থ হননের জন্য। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, নতুন আইনের খসড়ায় পূর্বের অনেক ধারা, উপধারা বাদ দেয়া হয়েছে যেগুলোর বদৌলতে ক্রেতা-ভোক্তাগণ প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হলে ক্ষতিপূরণ পেতে পারত। যে আইন ক্রেতা-ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় প্রণীত হয়নি সে আইনের খসড়া পুনরায় সংশোধনের জোর দাবি তোলা হয় ক্যাবের পক্ষ থেকে। ক্যাবের এবং জনসাধারণের চাপের মুখে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) সহায়তায় 'ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০০৭'-এর খসড়া চূড়ান্ত করে (কনজুমার ভয়েস, মে-জুন ২০০৭)। 'ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০০৭ পূর্বের যে কোনো খসড়ার চেয়ে সময়োপযোগী। অজ্ঞাত কারণে ২০০৭ সালের অধ্যাদেশটি পাশ না করে এই আইনের খসড়ার রদবদল করে ২০০৮' সালের জানুয়ারি মাসে ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০০৮ পুনরায় চূড়ান্ত করা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ গণমুখী আইন যা প্রায় চূড়ান্ত এবং একাধিকবার সরকারের নীতিগতভাবে অনুমোদন লাভে সমর্থ ক্রেতা-ভোক্তা আইনটি কেন বাস্তবায়িত হয়নি তার কারণ সকলের অজ্ঞাত না হলেও প্রকাশিত নয়। যার ফলে বাংলাদেশে ক্রেতা-ভোক্তাদের অবস্থা সেই তিমিরেই থেকে গেছে। বিভিন্ন মহল থেকে এর অনুমোদন ও প্রয়োগের জন্য গণদাবি উত্থাপিত হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বরং নতুন নতুন পদ্ধতিতে সংশোধন আনা হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধূম্রজাল থেকে মুক্ত হয়ে ২০০৯ সালে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন আলোর মুখ দেখলেও তেরো বছরেও বাস্তবায়নের চিত্র আশানুরূপ নয়। কারণ, এই আইনের কোনো প্রাধান্য বা আধিপত্যের ক্ষমতা নেই। "এই আইনের বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধানকে ক্ষুণ্ন না করিয়া উহার অতিরিক্ত হিসাবে কার্যকর হইবে" (ধারা ৩, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯)। এই আইনটিকে অতিরিক্ত বিবেচনা না করে, এটিকেই মূল আইন হিসাবে বলবৎ করা উচিত ছিল। এই আইনের ৪ ধারায় বলা হয়েছে, "সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন সেবা বা এলাকাকে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে"। আইনের বিধান সকলের জন্য সমান কিন্তু উপর্যুক্ত ধারা যে অব্যাহতির সুযোগ সৃষ্টি করছে সেখানে বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই এই ধারাটিকে বাতিল করা বাঞ্ছনীয়। কোনো ক্রেতা বা ভোক্তা প্রতারিত হলে, প্রতারণার ৩০ দিনের মধ্যে ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য সম্পর্কে মহাপরিচালক কিংবা অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকতার নিকট অভিযোগ না করলে উক্ত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না (ধারা ৬০) এবং ৬০ ধারার অধীনে অভিযোগ দায়ের হবার ৯০ দিনের মধ্যে মামলা দায়েরের নিমিত্তে

অভিযোগপত্র দাখিল করা না হলে, ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ করবেন না (ধারা ৬১)। অর্থাৎ একজন ক্রেতা-ভোক্তার মামলা করার নিজের কোনো অধিকার নাই (Tami, ২০১৬)। উল্লেখ্য প্রতিবেশি দেশ ভারতে The Consumer Protection Act, ২০১৯ অনুসারে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ভোক্তা দুইবছর সময় পান।

ভোক্তা অধিকারের সংরক্ষণ প্রয়াসে পরিপূরকরূপে বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে আরও একটি আইন প্রণয়ন করে যা 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' নামে পরিচিত। নাগরিকদের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকারকে আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত করার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ তৈরির অবকাশ ছিল, এই আইন তা নিশ্চিত করেছে। এই আইনের অধীনে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠিত হয়েছে কিন্তু সুবিশাল জনগোষ্ঠীকে এর সেবা প্রদানের জন্য যে সুবিস্তৃত কাঠামোর প্রয়োজন, তা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়নি।

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ভোক্তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা হবে কি না সেটা নির্ভর করে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সন্তুষ্টির উপর। অভিযোগ দায়ের করার ও মামলাটি আমলে নেয়ার পদ্ধতি এই আইনের সবচেয়ে দুর্বল দিক। ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিত করতে হলে ভোক্তার সরাসরি মামলা দায়ের করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো বেশিরভাগ ক্রেতাই জানেন না, প্রতিকার কোথায় ও কীভাবে চাইতে হয়। আর চাইলেই যে প্রতিকার পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। আইনানুযায়ী প্রতিটি জেলায় এর অধিদপ্তরের অফিস থাকার কথা থাকলেও ১৫টি জেলায় কোনো অফিস নেই (প্রথম আলো, ১৬মার্চ ২০২১)। এই আইনের ২(২২) ধারায় বলা হয়েছে "সেবা অর্থ – পরিবহন, টেলিযোগাযোগ, পানি-সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানী, গ্যাস, বিদ্যুৎ, নির্মাণ, আবাসিক হোটেল ও রেস্তোরা এবং স্বাস্থ্য সেবা, যাহা ব্যবহারকারীদের নিকট মূল্যের বিনিময়ে লভ্য করিয়া তোলা হয়, তবে বিনামূল্যে প্রদত্ত সেবা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।" পরিতাপের বিষয় যে, সেবার সংজ্ঞায় বিনামূল্যের সেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যদি কেউ বিনামূল্যে কোনো পণ্য বা সেবা গ্রহণ করে এবং সেসব সেবা গ্রহণ করে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সে প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নয়। ভোক্তা-অধিকার আইনে ফ্রি সার্ভিসকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অগ্রহণযোগ্য বিজ্ঞাপন, মোড়কে ভুয়া মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ মুদ্রণ, পণ্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান প্রভৃতিকে আইনের আওতাভুক্ত করা না গেলে ক্রেতা-ভোক্তা প্রতারণার হাত থেকে মুক্তি পাবে না। বর্তমানে অনলাইনে পণ্য কেনার প্রবণতা অধিকহারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনলাইন ব্যবসার পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ভোক্তাগণ অনবরত প্রতারণার শিকার হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য আইনটির যুগোপযোগীকরণের বিকল্প নেই।

এই আইনের অধীনে সরকারের বিভিন্ন সেক্টর থেকে সদস্য নিয়ে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা কাউন্সিল' গঠন করা হয়। অধিকাংশ সদস্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে নেওয়া হয়েছে এবং পরিষদটি সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সমস্ত সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। সুতরাং এটিকে উচ্চ আমলাতান্ত্রিক পরিষদ বলা যেতে পারে। যেহেতু আইনটি ভোক্তাদের

অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্তে পাশ করা হয়েছে, সেহেতু কাউন্সিলে ভোক্তাদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন ছিল। এখানে কোনো আইন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে আইন বিশেষজ্ঞ ও ভোক্তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং স্বাধীন প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

৪. উপসংহার

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিমণ্ডলে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। নতুন মাত্রা পেয়েছে ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারের বিষয়টি। এটা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারের বিষয়টি 'কমন ল' এর সময় থেকে প্রবর্তিত হয়েছে (Rahman, 1994)। এমনকি মধ্যযুগে মার্টিন লুথার কিং এবং জন কেলভিন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার চেষ্টা করেছেন, এবং সঠিক মূল্যে পণ্য বিক্রয়কে উৎসাহিত করেছেন (Loudon & Bitta, 1993)। বর্তমানে এই বিষয়টি আইনগতরূপ পেয়েছে, ইতোমধ্যে সেই আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও নিশ্চিত হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ক্রেতা-ভোক্তা অধিকারকে মানবাধিকারের অংশ হিসাবে নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণীত হলেও প্রকৃত অর্থে এই আইনটি বাংলাদেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বাংলাদেশের নিরীহ ক্রেতা-ভোক্তাগণ প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসের থাবায় পিষ্ট হচ্ছে যা প্রতিরোধের জন্য সরকারের উদ্যোগ, জনসাধারণের সচেতনতা ও যথোপযুক্ত আইনের বাস্তবায়ন অতীব জরুরি। আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের ক্রেতা-ভোক্তা তাদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে সচেতন হবেন এবং অচিরেই বাংলাদেশ সরকার গণমুখী ক্রেতা-ভোক্তা অধিকার আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

টীকা

১. (http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/credit/crdright.shtm)

২. (http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070512215709AAHqdA6)

৩. (http://www.maharashtradirectory.com/bureau_of_indian_standards.htm)

৪. (http://www.goog le.com/search?hl=en&q=consumer+rights+present+status+in+Bangladesh&btnG=Search)

সহায়কপঞ্জি

কাজী ফারুক এবং শামসুজ্জোহা (২০০৬)। *ক্রেতা-ভোক্তা আন্দোলনের স্বরূপ অন্বেষা*। পূরবী অফসেট প্রেস, ঢাকা।

সৈয়দ রাশিদুল হাসান (২০০২), "ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ : আমাদের অবস্থান কোথায়?"। *বিপন্ন ক্রেতা- ভোক্তা স্বার্থ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*। বর্তমান সময়, ঢাকা

Aaker, D. A & Day, G.S. (1984), *Consumerism*, 4th ed. New York: The Free Press.

Ahmed, Borhan (2001), "Right Abused people and Consumers Protection Law", *Consumer Voice,* Special issue Dhaka: CAB, December.

Bhattacharjee, Haripada & Sheel, Samir Kumar (2001), "Consumers in Bangladesh : Rights and Setbacks", *Social Science Review*, Vol.18, No.1, June : pp.93-106.

CAB (Consumers Association of Bangladesh) is a consumer organisation, working

since 1978 to ensure the consumer rights in Bangladesh.

Edling, Axel (1998), *Market Law in Sweden Consumer Protection*, Sweden : Swedish Consumer Agency.

Gunasekera, Leel (2002), "Aspects of Consumer Protection in Sri-Lanka", *Economic Review*, Vol. 27, Nos. 10 & 11, January/February : pp.5-7.

Haque, Zahidul & Basher, Sayed Abul, "Protecting Rights of Consumer: Enactment of Appropriate Laws Necessary", http://dept.econ.yorku.cal/~basher/consumerism_TI.pdf (accessed on 04.10.2005).

http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070512215709AAHqdA6(assessed on 28th March 2008).

http://www.google.com/search?hl=en&q=consumer+rights+present+status+in+Bangladesh&btnG=Search (assessed on 28th March 2008).

Loudon, David L. & Bitta, Albert J. Della (1993), Consumer Behavior : Concept and Application, 4th ed. New York : McGraw- Hill Inc.

Mowen, John C. (1993), Consumer Behavior, 3rd ed., New York : Macmillan Publishing Company.

Rahman, Mizanur (1994), Consumer Protection Law and the Swedish Approach, Dhaka : Prudential Publications.

Sweden. Se, "A New Swedish Model : Safe, Clean Food" [www document], http://www.sweden.se/templates/PrinterFriendlyArticle.asp?id==2287 (assessed on 15 October 2004).

The Daily Star (Dhaka), 12 August 2006.

Verma, D.P.S. (2002), "Developments in Consumer Protection in India," Journal of Consumer Policy, vol. 25 : 107-123.

Wijesinghe, F.D. C. (2002), "Consumer Rights in Comparison with other Countries UK, Australia, India", Economic Review, Vol. 27, Nos. 10 & 11, January/February: 8-1

Tami, Mollik Uddin (2022), "Consumer Rights Protection and Bangladesh", https://bdlawdigest.org/consumer-rights-protection-in bangladesh.html?fbclid=IwAR0aCHngqTUvPDWaaMjLTnyJqR0KjBKZ2pJbZeWA46W8BVbkq5oN65he2UA Accessed on 23 June, 2022,

CMS Law- Now(2022), New Consumer Protection Law Announced, https://www.cms-lawnow.com/ealerts/2022/04/new-consumer-protection-law announced?fbclid=IwAR3PY4ewh_cp7JOtC_XkGnpj25DRoepUm6YezDwOpwAuL7udKJyTlbmQA#:~:text=Following%20the%20Government's%202021%20Consultation,a%20response%20to%20the%20consultation Accessed on 24 June, 2022.

পত্রিকা

কনজুমার ভয়েস, ঢাকা : মে-জুন ২০০৭